International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-III, April 2017, Page No. 1-9
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

তারাদাসের তারানাথ: বিশ্বাসের পারদে বিস্ময়ের উত্তাপ

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

'Taranath Tantrik' is the story of 'Taranath' first written by Bibhutibhusan Bandyopadhyay in Bengali literature. In his life time he has written only the two stories of Taranath. The expedition, experience and intoxication of story telling have made Taranath most popular and ever lasting character in the world of Bengali short story. The stream of tradition made by Taranath was also being carried by Taradas Bandyopadhyay, son of Bibhutibhusan. Taranath, the Strange, exotic, mystical character is mainly a fortune-teller. But he has a vast knowledge on tantra and telepathy also. In his life time he has got some mystical power, by which he could able to tell and feel about the upcoming future of human as well as nature also. The main story teller himself and his friend named 'Kishori' are the devoted listeners of all stories described by Taranath in different times. The surprising imagination and heart-beating motion of each story was above all kind of our trifle trust that we deserve in this universe. The world of Tantra is filled with unnatural and uncanny feelings where our mind can go only with full of its freedom. The phantoms of fictitious world have come into the realisation of readers in term of literary phenomenon in such way that can not be expressed in a single word. Mind and soul of all eternal entities with their inexplicable activities has become a dark truth in the womb of each expose.

"আমি এটা বিশ্বাস করি যে মানুষের আয়ু দ্বারা মানুষের সত্যিকার বৃহত্তর জীবন মাপা যায় না—এ একটা বিরাট বৃত্ত, হাজার হাজার বছর এর পরিধি। তুমি নেই, আমি নেই—আছে তোমার আত্মা, আমার আত্মা—লক্ষ বছর তাদের স্থিতিকাল, সে বিরাট vision দিয়ে জীবনকে যে যে দেখেছে, জীবনকে সত্যিকার সেই চিনেছে।"[১] রমা দেবীকে বিবাহের পূর্বে বিভূতিভূষণের লেখা চিঠির একটি অংশ এটি। জীবনের শেষে জীবের নতি অথবা তথাকথিত mundane world সম্পর্কে লেখা আছে 'বৃহদারণ্যক' কিম্বা 'ঈশোপনিষদ'-এও। একসময় সেই অতীন্দ্রিয় জগতের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। নানা জায়গায় ভ্রমণকালে নিজের জীবনে সাড়া জাগানো নানা বিচিত্র অনুভূতি কিংবা অভিজ্ঞতা তো বটেই, প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর মৃত্যুরোত্তর জীবনের প্রতি তাঁর এই অদম্য ও অজানা আকর্ষণ একসময় তাঁকে প্রায় ঘরছাড়া করেছিল। তাঁর লেখা অতিলৌকিক নানা গল্প ও গল্পগ্রন্থ যথাঃ 'বৌ চণ্ডীর মাঠ', 'গঙ্গাধরের বিপদ', 'অভিশপ্ত', 'হাসি', 'কিন্নরদল' প্রভৃতিতেও নানা ইঙ্গিতে তাঁর এই বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত হয়েছে। কখনও প্রকৃতি চিত্রণের মধ্যে দিয়ে অপার্থিব অনুভূতি ('বৌ চণ্ডীর মাঠ') আবার কখনও অলৌকিক জগতের পথে চালিত মন ('কিন্নরদল') বিভূতিভূষণের গল্পকে বস্তুতই এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। তাঁর 'কিন্নরদল' গল্পগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলো তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পগুলি। সে গল্পে বরাকর নদীর নির্জন তীর ও তটরেখা,

চন্দ্রালোকিত বালুকাময় দিগন্ত, শালবনের অস্পষ্ট ইঙ্গিতাভাস যেমন অজানা রোমান্সের রহস্যঘন ভয়াবহতা জাগায়—তেমনই তা নিষ্ঠুরতা, জিঘাংসা আর প্রতিহিংসার এক বিমিশ্র বহিঃপ্রকাশও বটে। গল্পগুলিতে যে অতিপ্রাকৃতিক সাধনার বিবরণ আছে তাও কৌতূহলাত্মক। আসলে বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মিক চেতনার স্বরূপ অনুসরণ করলে বোঝা যায় পরলোক তত্ত্ব, সর্বলোকাতীত সত্তা, আসক্তি ও মায়া সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ও আবেগের নির্যাস থেকেই একসময় তাঁর এ জাতীয় গল্পের ভাবনাগুলি উঠে এসেছে।

বিভূতিভূষণের এক সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর পুত্র প্রয়াত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ জীবনে সরকারী চাকরীর পাশাপাশি তাঁর লেখক জীবনেও যে এই অতিলৌকিক বিশ্বাসকে সাঙ্গিকৃত করেছিলেন তার অন্যতম উদাহরণ হলো তাঁর লেখা গল্পগ্রন্থ 'তারানাথ তান্ত্রিক'। তবে, তারাদাসের লেখা 'তারানাথ তান্ত্রিক'-এর গল্পে প্রবেশের আগে আরো দু-চারটি কথা বলে নেওয়া আবশ্যক। বলাই বাহুল্য, 'তারানাথ তান্ত্রিক' রচনার মূল আইডিয়াটি তারাদাস পেয়েছিলেন পিতা বিভূতিভূষণের কাছ থেকেই। সেই আইডিয়ার পিছনেও একটা গূঢ় সত্য ছিল। বিভূতিভূষণের নিজের অতিলৌকিক বিশ্বাসটি কেমন ছিল সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তারাদাস বলেনঃ "বিভূতিভূষণ পরলোকে তো বিশ্বাসী ছিলেনই উপরন্তু তিনি বলতেন আমাদের এই দৃশ্যমান বিশ্বজগতের ভেতরেই আরো অনেক জীবজগৎ ছড়িয়ে রয়েছে, যা সময়ের অন্য ডাইমেনসনে অবস্থিত এবং কাজে কাজেই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তাঁর 'দেবযান' এবং প্রকাশিত অপ্রকাশিত বহু দিনলিপিতে এই গভীর বিশ্বাস ও উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।"[২] বিভূতিভূষণের অন্তরে এই অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস জন্মেছিল বস্তুচেতনার গভীরে প্রবেশের ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ ইচ্ছাকল্পের জোরেই। তিনি যতখানি subjective ছিলেন, তার চেয়েও বেশি ছিলেন objective আর তাই বলতে পেরেছিলেনঃ "ওপারের সঙ্গে এপারের একটা যোগ আছে। আছেই আছে। মৃত্যু এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষের কাছে শোকের জিনিস। কিন্তু শোক তো এই ভেবে—মৃত্যু একটা অন্ধকার সম্পর্কহীন বিচ্ছেদ। তা যদি না হয়!"[৩] এই ঔৎসুক্যের স্পন্দন যখন চিন্তাশীল মনে আলোড়ন জাগিয়ে তোলে তখনই বোঝা সম্ভব হয়, তাঁর অতিপ্রাকৃতিক সত্তার বোধ সময়ের ডাইমেনশনে—একই স্পেসে (Space) বহু সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী আর তারা সকলেই অবস্থান করছে একই সাথে—পৃথক যাদের ব্যক্তিত্ব অথবা অস্তিত্ব, অদৃশ্যও; সময়ের নূন্যতম পার্থক্যের মধ্যে জীবনের এদিকে আর ওদিকে নানাতর তার অবস্থান, হয়তো বা আরও বেশি কিন্তু তাকে কখনও অস্বীকার করা যায় না। সেই ব্যবধানটা খালি চোখে দেখা যায় না, অথচ তার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও আছে, দর্শন বা বিজ্ঞানের বিদেশী শাখা যাকে ইতিপূর্বেই তাদের চর্চার বিষয় করে নিয়েছে। বিভূতিভূষণ নিজেও পৃথিবীর এই প্রকৃতিধর্ম সম্পর্কে একস্থানে বলেনঃ "এই পৃথিবীর একটা Spiritual Nature আছে। আমরা এর গাছপালা, ফুল-ফল, আলো-ছায়া, আকাশ-বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি বলে, শৈশব থেকে এদের ঘনিষ্ট পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি অনুভব করা আমাদের বড় কঠিন হয়ে পড়ে।"[৪] সাধারণ মানুষের পক্ষে পরমা প্রকৃতির এই রহস্য বোঝা অসম্ভব হলেও প্রকৃতির এমন Spiritual Nature যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ভাবে অর্জন করে নেয় বা কোনো ভাবে তা তার ব্যক্তি প্রকৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জুড়ে যায় তখনই ধীরে ধীরে তার মধ্যে এক Super Natural Power-এর আবির্ভাব ঘটে। আর তারই গুণে সে ধীরে ধীরে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা হয়ে যায় আর সহসাই তারানাথ তান্ত্রিকের মতো একটি মানুষের জন্ম ঘটে। সেই তারানাথ তান্ত্রিক, যে প্রকৃতির প্রতিটি হৃদস্পন্দনকে অবিশ্বাস্য রকম ভাবে অনুভব করতে পারে, তার প্রতিটি পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রকৃতি সহ মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেওয়াও যাঁর কাছে অতি স্বাভাবিক বলে মনে হয়—তেমনই এক অসাধারণ মানুষের পরিচয় পাই আমরা 'তারানাথ তান্ত্রিক' গল্পে।

বিভূতিভূষণের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিদেহী আত্মার জগৎ সম্পর্কে কবির অনুভব। আর সেই অনুভবকে নিজের অলৌকিক শক্তিতে ধারণ করে আছে তার সৃষ্ট চরিত্র তারানাথ। বস্তুতই প্রথমা স্ত্রী গৌরীর মৃত্যুর পর আবেগে ভেঙে পড়ে বিভূতিভূষণ তীব্র শোকে আকুতি করেছেন দিনের পর দিন! স্ত্রীর মৃত্যুর কিছু দিন পর বিভূতিভূষণের বোন মণিও মারা যান। ব্যারাকপুরের বাড়িতে পর পর দুটি আঘাতে তখন পাগল হয়ে যাওয়ার মতো দশা বিভূতির।

কলেজের বন্ধুরা একরকম জোর করে তাঁকে কলকাতা নিয়ে আসে। একদিন টালিগঞ্জের দিকে একলা ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় এক সন্ন্যাসীর। তিনিই বিভূতিকে অশরীরী আত্মার বিচরণ সম্পর্কে ব্রহ্মসূত্রের কথা বলেন। বিভূতি অবাক হয়ে শোনেন, বৃহদারণ্যকে জনকসভায় মহর্ষি আত্মা-তত্ত্বের কী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সেই শুরু। তারপর থেকে সারা জীবন বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করে এসেছেন আত্মা-চর্চায়। আত্মাকে ডাকলে তাকে পাওয়া যায়। শুধু ডাকার মতো ডাকতে জানা চাই। মৃত গৌরীকে দেখতে চেয়ে সন্ন্যাসীর কাছেই শিখেছিলেন 'মণ্ডল'। অর্থাৎ প্ল্যানচেটে আত্মাকে ডাকা। যেখানেই গিয়েছেন, আমৃত্যু সেই সাধনাই করেছেন। দরজা-জানলা বন্ধ করে, ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে ডেকেছেন গৌরীকে। কথা বলেছেন তার সাথে একা একা গভীর নিশীথে। কান্নায় প্রিয়তমার শোকে আকুল হয়েছেন। বিভূতির সেই সময়ের প্রিয় বন্ধু নীরদ সি চৌধুরী লিখেছেন, বিভূতিভূষণের পরলোকচর্চার মতিগতি। হরিনাভি-রাজপুরে যখন অ্যাংলো স্যানসক্রিট ইনস্টিটিউশনে তিনি পড়াতে যান, সেখানেও অল্প বিস্তর জানাজানি হয় তাঁর পরলোকচর্চার খবর। ক্রমশ পরলোক নিয়ে তাঁর অতি-জাগতিক বিশ্বাসের কথা ঢুকে পড়ে তাঁর লেখা গল্পে, উপন্যাসে। কখনও সখনও তা নিয়ে সচেতন হয়ে ছেঁটেও ফেলেন মূল লেখা থেকে সেই আধি-ভৌতিক প্রসঙ্গ। তবু শেষ রক্ষা হয়নি! মৃত্যুর পর আত্মার উপস্থিতি নিয়ে বিভূতির বিশ্বাস যেন দাবানলের মতো আবির্ভূত হয় 'দেবযান' গল্পের প্লটের বাঁকে বাঁকে। মৃত্যুর পর কোথায় থাকে আত্মা? শবের কাছেই কি দাঁড়িয়ে থাকে? কী ভাবে উড়ে যায়? ফিরে আসে কি? সব উত্তর যেন মিলে যায় যতীন চরিত্রটিকে নিয়ে তাঁর এই লেখায়। তাঁর জীবনীকার কিশলয় ঠাকুর জানিয়েছিলেন যে, যে সময় 'দেবযান' প্রকাশ হচ্ছে, তার বহু আগে থেকেই বনগাঁর বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠতা বাড়ান। তিনিও পুত্রশোকে কাতর ছিলেন। দুঃখ ভুলতে প্ল্যানচেটে তিনি ছেলের সাথে কথা বলতেন। বীরেশ্বরবাবুর সংগ্রহে ছিল পরলোকচর্চার নানা বই। সে সব বইতে ডুবে থাকতেন তিনি। পাতায় পাতায় নিজের নোটও লিখে রাখতেন। বিভূতিভূষণের পরলোকচর্চার বিষয়টি নিয়ে সে সময় লেখকদের অনেকেই খবর রাখতেন। বিভূতির জীবনকথা জানাচ্ছে, প্রমথনাথ বিশীর ছোট ভাই মারা গেলে, শোক-সন্তপ্ত গোটা পরিবার বিভূতির কাছে এসেছিল। বিভূতি শ্লেটে দাগ টেনে মৃত ব্যক্তির আত্মার গতিপথও দেখিয়েছিলেন। তাঁদের এও বুঝিয়েছিলেন, আত্মার জন্য শোক করতে নেই! তাতে আত্মার দহন বাড়ে! দিন যত ফুরিয়ে এসেছে, পরলোকে বিশ্বাস যেন তত বেড়েছে বিভূতির। এ কথা সত্য যে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্যের কার্যকারণ যতদিন আমাদের কাছে অজানা থাকবে ততদিনই আত্মা, পরলোক এবং দৈবী শক্তি সম্বন্ধে মানুষের অবচেতন মনের বিশ্বাসও অনড় ও অচল হয়ে থেকে যাবে। ব্যক্তি জীবন থেকে সাহিত্য জীবনে বিভূতিভূষণের এই বিশ্বাস আর অনুভবই সৃষ্টি করেছিল তারানাথ তান্ত্রিক নামক এমন এক চরিত্রকে। তাঁর 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' থেকে শুরু করে তারাদাসের 'তারানাথ তান্ত্রিক' বা 'অলাতচক্র'-এর গল্পগুলি তারই পরম্পরাবাহী।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারানাথ কে নিয়ে গল্প লেখা শুরু করলেও দুটির বেশি গল্প লিখে যেতে পারেননি। পিতার সেই অসমাপ্ত কাজকে যথার্থ পরিণতি দান করতে পেরেছিলেন পুত্র তারাদাস। প্রথম জীবনে শিক্ষক ও পরবর্তী জীবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকরিক রূপে মহাকরণে কর্মরত ছিলেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অপুর ছেলের কাহিনি অবলম্বনে লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম 'কাজল'। প্রায় আড়াই দশক পরে অপুর পৌত্রকে নিয়ে লিখেছেন 'তৃতীয় পুরুষ'। তবে তাঁর অতিলৌকিক গল্পসম্ভার হিসাবে 'তারানাথ তান্ত্রিক' ও 'অলাতচক্র' জনপ্রিয়তার শিখর স্পর্শ করেছে। ২০০০ সালে পুজোর সময় দিল্লিতে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে বঙ্গভবনে বসে লেখক লিখতে শুরু করেছিলেন 'অলাতচক্র'-এর কাহিনিটি। মাত্র চারটি অধ্যায় লেখার পর তিনি করোনারি বাইপাস অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন। অনেক দিন অসুস্থতার পর একসময় তিনি সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু রোগের নানান জটিলতার কারণে, তিনি নিজে বসে আর লিখতে পারলেন না। তাই তিনি তখন মুখে বলে যেতেন, আর তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী মিত্রা বন্দোপাধ্যায় তার শ্রুতিলিখন নিতেন। '**কথাসাহিত্য**' পত্রিকায় ২০০০-এর ডিসেম্বর থেকে ২০০৩-এর জানুয়ারী পর্যন্ত 'অলাতচক্র' প্রকাশিত হয়েছিলো। জ্বলন্ত অঙ্গার বা জ্বলন্ত কাঠ বেগে ঘোরালে যে চক্রাকার আগুনের রেখা দেখা যায় তাকে অলাতচক্র বলা হয়। গল্পগ্রন্থের এহেন নামেই রয়েছে তন্ত্র-

উপচারের লক্ষণ আর তৎসম্বন্ধিত শাব্দিক শিহরণ। এখানেও আছেন সেই তারানাথ তান্ত্রিক। তবে এখানে তারানাথ দেখেছেন তার চেয়েও বেশী অলৌকিক শক্তিধর মানুষকে, যাদের অভিজ্ঞতা আর সহযোগিতা আবিষ্ট করেছে তারানাথকে। তাকে নানা বিপদ থেকে করেছে উদ্ধার। হাল আমলে রাজর্ষি দাশ ভৌমিকের লেখা 'বাঙালির উড়ান কাহিনি ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থেও তারানাথ প্রসঙ্গ এসেছে।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেন একসময় বলেছিলেন- 'I have no doubt that in reality the future will be vastly more surprising than anything I can imagine. Now my own suspicion is that that the universe is not only queerer than we suppose, but queerer than we can suppose.' অর্থাৎ তাঁর মতে সত্য যে কল্পনার চেয়ে শুধু বিচিত্রই নয়, আমাদের কল্পনা যতদূর পৌঁছায় সত্য তার চেয়েও অদ্ভুত। গল্পকার তারাদাস নিজেও বলেন যে, এ গ্রন্থের কাহিনিগুলো পাঠকেরা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যা নিয়েই পড়তে শুরু করুন না কেন, আসলে তা সত্য। এ কথারই সমর্থনে তাঁর আরো জোরালো যুক্তি হলোঃ "এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত কাহিনি আমার চিন্তাপ্রসূত নয়, বেশীরভাগই অভিজ্ঞতাপ্রসূত। অলৌকিক এবং অতিলৌকিক ঘটনার দিক শেষ হয়ে যায় নি, কেবল অনেক সময় আমরা তাদের অলৌকিক বলে চিনে নিতে পারি না—এই যা।"[৫] তারানাথের গল্পগুলি গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার আগের আট বছর তা 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারানাথের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে গল্পকার অস্পষ্টতা রাখলেও পাঠকের পক্ষে তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়া স্ত্রী কল্যাণীদেবীর বাবা ষোড়শীকান্ত তান্ত্রিক ছিলেন। দীক্ষাও নিয়েছিলেন এক ভৈরবীর কাছে। তাঁকে নিয়েই একসময় বিভূতিভূষণ 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' লিখেছিলেন। জামাইয়ের পরলোক নিয়ে অতি উৎসাহে অবাকই হতেন ষোড়শীকান্ত। জীবনের শেষ পর্বে লেখক যখন ব্যারাকপুরে রয়েছেন তখন দেখা মিলল এক ভৈরবীর। বিভূতিভূষণও মেতে উঠলেন তাঁর সঙ্গে। ভৈরবী শবসাধনা করতে এসেছেন জেনে, বিভূতিও নিত্য যাতায়াত বাড়ালেন। বিভূতির এই কাজকর্মে রেগেও যেতেন স্ত্রী কল্যাণী। তবু কী এক মায়ায় নাছোড় বিভূতিকে আগলে রাখতে পারতেন না! রাতভোর তিনি সাধনায় মেতে থাকতেন স্ত্রী-সংসার ভুলে। তাঁর দিনলিপির পাতায় পাতায় পরলোক নিয়ে সেই সব বিশ্বাসের কথা রয়েছে। তারই আর এক সংশ্লেষ 'দেবযান' উপন্যাস। বিভূতিভূষণের তারানাথের সাথে গল্পকথকের পরিচয় ঘটেছিল কিশোরীর সাথে জ্যোতিষার্ণব তারানাথের মট্ লেনের বাড়ি গিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের সুবাদে। আর সেই পরিচয়ই ক্রমে তারানাথের জীবন অভিজ্ঞতার নানা অদ্ভুত ঘটনা জানতে গল্পকথককে অনুপ্রাণিত করেছিল। পাগলী সন্ন্যাসিনী, অহল্যাবাঈ-এর ঘাটের সৌম্যকান্তি সাধু, অদ্ভুত যোগশক্তির বলে বলীয়ান কাশীর দেড়শো বছরের সন্ন্যাসী রামনিধি, হাঁকিনী মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ, শব সাধনা, ষোড়শী নারী, মহা ডামরী সাধনা এরকম অজস্র বর্ণনার মধ্যে দিয়ে হাড় হিম করা অনুভূতি দিয়ে গড়া বিভূতিভূষণের তারানাথের কাহিনি।

একইভাবে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারানাথ তান্ত্রিক'-ও আদতে অতিলৌকিক ছোটগল্পের সংকলন এবং তা বিভূতিভূষণের তারানাথেরই উত্তরকালীন সংস্করণ। মট্ লেন নিবাসী মধ্য পঞ্চাশের তারানাথ পেশায় একজন জ্যোতিষী। ছোটবেলাতেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসা তারানাথের সময় কেটেছে শ্মশানে আর সাধুদের সান্নিধ্যে। তবে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি কম নয়। পাসিং শো সিগারেট, মুড়ি সহযোগে চা অথবা রাবড়ি সহযোগে গল্প শোনার উৎসাহী শ্রোতা পেলেই তার গল্পের ঝুলি উন্মুক্ত হয়। লেখকের বয়ানে তারানাথের অভিজ্ঞতাগুলিই 'তারানাথ তান্ত্রিক' গল্পগ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে। গ্রাম বাংলার পরিবেশকে উপজীব্য করে ডাকিনী, যোগিনী, কাপালিক, শব-সাধনা, অতিপ্রাকৃত ও অশরীরী অস্তিত্ব নিয়ে লেখা প্রতিটি গল্পই অন্য এক জগতের সন্ধান দিয়েছে যার অস্তিত্ব প্রমাণ করে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'।

বিভূতিভূষণের সময় থেকে ধরলে তারানাথের ধারাবাহিকতা প্রায় ছয় দশকের। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মানুষ তারানাথের বয়স গল্পে বাড়ে নি। তারাদাসের হাতেও সে সেই মধ্য পঞ্চাশেই। তান্ত্রিক তারানাথ থাকেন

কলকাতার মট্ লেনেই। লেখকের মতে এ সেই কলকাতা—যার পরিবেশ এখন স্বপ্নবৎ মিলিয়ে গেছে। তারাদাসের 'তারানাথ তান্ত্রিক'-এর প্রথম গল্পগুলিতে অধ্যায়গুলির আলাদাভাবে কোনো নাম নেই। কিন্তু পরের দিকের গল্পগুলিতে দেখা যায় তারাদাস তার বিভিন্ন শিরোনাম দিয়েছেন। গল্পগুলিতে কখনো তারানাথের শৈশব জীবন, মধুসুন্দরী দেবীর স্মৃতি থেকে শুরু করে প্রাজ্ঞ ও পরিণত তারানাথের কীর্তিগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প শোনার আগ্রহ নিয়ে তার বাড়িতে কখনো ছুটির মেঘলা, থমথমে বর্ষাভেজা বাদলা দিন, সন্ধ্যের ফাঁকা বৈঠকখানা—আবার কখনো বা নির্জন বিকেলে হাজির হয়েছেন দুই বন্ধু—গল্পকথক নিজে ও তার বন্ধু কিশোরী। তারানাথের প্রিয় পাসিং শোর প্যাকেট তার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন তারা। তারানাথের মেয়ে চারি এনেছে মুড়ি, চা। আর তারপর জমে উঠেছে গল্প। সে গল্পে বীরভূমের গ্রাম্য শ্মশানে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ মাতু পাগলীর কাহিনি, বরাকর নদীর বালুকাময় তীরে শালবনের পাশে শুক্লা পঞ্চমীর স্বপ্নিল জ্যোস্নায় মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব, শ্বেতবগলার পূজো—তার জীবনে এমন কত কি ঘটে যাওয়ার কথা বলে তারানাথ গল্প শোনার ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতো গল্পকথক ও তার বন্ধু কিশোরীর মনে।

'তারানাথ তান্ত্রিক'-এর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার একেকটি কাহিনিতে একেক রকম আস্বাদ। অতিপ্রাকৃতিকতা কম-বেশি প্রায় সব গল্পেই মিশে আছে। প্রথম গল্পে এক জোলো মেঘলা দিনে তারানাথ তার জীবনের অদ্ভুত এক কাহিনি বলতে শুরু করেছে। গল্পে তারানাথের জীবন অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হয়েছে তাদের গাঁয়ের বটতলার কোনো এক সৌম্যমূর্তি সাধুর ভবিষ্যৎবাণী ফলে যাবার কথা। সাধুর বলে দেওয়া গাত্রবন্ধনের মন্ত্র পড়ে মাধব ঘোষ সহ সে ও মাধব ঘোষের গোটা পরিবার কিভাবে রক্ষা পেলো আর অমানুষিক বেতাল প্রচণ্ড ক্রোধে মাধব ঘোষের আমবাগান থেকে বিরামখালির শ্মশানে ফিরে গিয়ে হত্যা করলো তারই সৃষ্টিকর্তা কাপালিককে তারই রোমহর্ষক বর্ণনা আছে এই গল্পে। পরের আর একটি গল্পে দেখি ব্যবসায়ী রামদুলাল মিত্র জ্যোতিষার্ণব তারানাথের কাছে এসেছে তার রাজবলহাটের কাছে মতিপুর গ্রামে কেনা পুরোনো দোতলা জমিদারবাড়ীতে ঘটে চলা অদ্ভুত সমস্যার কথা জানাতে। সে ও তার বড় ছেলে শচীদুলাল ঐ বাড়ীর পাঁচিলের পাশে আগাছার জঙ্গলে প্রায় প্রতি রাতেই স্ত্রীলোকের কান্নার আওয়াজ শোনে। অবশেষে তারানাথ এসেছে সেখানে। সাদা পাথরে বাঁধানো স্বচ্ছ মেঝেতে সে ফুটে উঠতে দেখেছে স্ত্রীলোকের আবছায়া মুখ। দিনে দিনে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যন্ত্রণাকাতর অমানুষিক কষ্টে দীর্ণ সে মুখাবয়ব। অবশেষে কান্নার আওয়াজ এসেছে পায়ের তলার মেঝে থেকে। শাবল ও কোদাল দিয়ে মেঝের টালি, সুরকি আর মাটির সোলিং খুঁড়ে পাওয়া গেছে এক নারীর কংকাল। সেই কংকালের হাড়ের স্তূপ বস্তায় করে গঙ্গায় ফেলে দেবার পর বন্ধ হয়েছে কান্নার আওয়াজ। অতীতে জমিদার বাড়ীতে অত্যাচারিতা নারীর শেষপর্যন্ত ঘটেছে সদগতি। পরবর্তী আর একটি গল্পে দেখি, ধনী ভূস্বামী রামরাম চৌধুরী ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করেছিলেন দরিদ্র শ্রীপদকে। রামরামের মৃত্যুর পর তার চিতার আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে অর্ধোন্মাদ শ্রীপদ অভিশাপ দেয় রামরামের বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না বলে। এরপরের ঘটনা রোমহর্ষক। শ্রীপদকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এরপর একে একে সন্ন্যাসরোগে চৌধুরী পরিবারের কৃষ্ণরাম ও শিবরাম চৌধুরী গত হন। শ্রীপদর অতৃপ্ত আত্মা তার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। এমন কি চৌধুরী পরিবারের এ বিপদ কাটাতে অমাবস্যা রাত্রে তারানাথের যজ্ঞের আপ্রাণ আয়োজনও শেষমেশ ব্যর্থ হয়ে যায়। চৌধুরী বংশ অকালে ধ্বংস হয়ে যায়। গল্পের শেষের আয়রনিটা বড় সুন্দর। তারানাথের কথায়ঃ "কি, শেষটা পছন্দ হলনা, কেমন? ভাবো তো, জিতটা তো নিপীড়িতজনেরই হলো। চৌধুরী পরিবার বেঁচে গেলে সেটা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার হত কি? পৃথিবীর আদালতে এই মানুষগুলো বিচার পায় না, বড় আদালতে যে এখনো সুবিচার হয় তা তো প্রমাণিত হল। একটু থেমে বললো, অবশ্য অনেকগুলো মানুষ—যারা শ্রীপদর ভাগ্য বিপর্যয়ের ব্যাপারে সরাসরি জড়িত ছিল না—তারাও কষ্ট পেলো। তা সে আর কি করা যাবে, এসব নিয়তির অখণ্ড বিধান।"[৬] এ যেন শোষিতের হয়ে শোষকের বিরুদ্ধে বিধাতার ন্যায়দণ্ডের অন্তিম অমোঘ বিধান—যার কথা বেদবাক্যের মতো তারানাথের মন্তব্যে ধ্বনিত হয়েছে। ভৌতিক গল্পের আবহে শোষক-শোষিতের এহেন নির্মাণ আর কোনো গল্পকার করেছেন বলে অন্ততঃ আমার জানা

নেই। পরের গল্পে সান্ধ্য আসরে গল্পকথক ও কিশোরীকে তারানাথ তার ছোটবেলার ঘটনা বর্ণনা করেছে। এ গল্পে আট বছর বয়সের তারানাথের তীব্র জ্বরের অসুখ কাটাতে বাবা ও ঠাকুর্দার উদ্যোগে জ্বরাসুরের পূজো করা হয়। জ্বরাসুরের মূর্তি ভয়ংকর। কিন্তু তাকে জলে ভাসানো চলবে না। ছাগল বলি দিয়ে তার রক্ত দিয়ে ঐ মূর্তিকে গলিয়ে ফেলতে হবে। জ্বরাসুরের পূজায় ঠাকুরদা নিজের নামে সংকল্প করেছিলেন। পূজার ছ-মাসের মধ্যে পুঁথির শেষ পাতায় লেখা বর্ণনা মতো তার মৃত্যু হয়। নিজের প্রাণের বিনিময়ে তিনি প্রাণাধিক প্রিয় নাতনি তারানাথকে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এ গল্পের শেষে বেদনা ও করুণ রসের সিঞ্চন লক্ষ্য করা যায়।

'তারানাথ তান্ত্রিক'-এর একটি গল্পে তারানাথের জন্মক্ষণের বৃত্তান্ত রয়েছে। তারানাথ ক্ষণজন্মা। অদ্ভুত সে বৃত্তান্ত লেখকের ভাষায়ঃ "জন্মের সময় থেকেই বোধ হয় ঈশ্বর আমার জীবনের গতিপথ নির্ণয় করে দিয়েছিলেন। আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই সেই মুহূর্তে আকাশ দিয়ে একটা বিরাট উল্কা ছুটে গিয়েছিল।"[৭] এ বর্ণনার মধ্য দিয়েই এক অলৌকিক শক্তিধর মানুষের আবির্ভাব সূচিত হয়েছে। গল্পের কোনো কোনো বর্ণনা বেশ কৌতুকময়। যেমনঃ "চোখ বুঁজে সিগারেটে টান দিতে দিতে একটু পরে তারানাথ বলল—তবে কি জানো? তামাকের মৌজ সিগারেটে নেই। এই যে সোঁদা সোঁদা গন্ধ, কড়া ধাঁক, গুড়ুক গুড়ুক শব্দ—সব মিলিয়ে একটা দারুণ আমেজ। তারপরে ধরো, ঠিকরে গুঁজছি, তামাক আর টিকে সাজাচ্ছি, মনোযোগ দিয়ে ফুঁ দিচ্ছি, আর মনের ভেতর—এই হয়ে গেল—এক্ষুনি আমি তামাক খাব—এই ভাব। সেটাও একরকমের মেজাজ, ওই অপেক্ষাটা। আর সিগারেট কি, না—এই ধরালাম, দু-দশটা টান দিয়ে ফেলে দিলাম—চুকে গেল।"[৮] এই বর্ণনায় যেমন হালকা মজা রয়েছে তেমনই হুঁকো-কলকের বনেদিয়ানাকে লেখক সেকালের বাঙালির সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে যেন আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কোথাও কোথাও তারাদাসের বর্ণনা স্বয়ং বিভূতিভূষণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন লেখকের বর্ণনায়ঃ "সে বয়েসটা এক অদ্ভুত বয়েস, বুঝলে? রেড়ির তেলের প্রদীপ, ছোট ছোট ফোঁড় দেওয়া পদ্মকাঁথা, আরামদায়ক রোদ-ঝিমঝিম-করা নির্জন দুপুর, উঠোনের চাটাইতে শুকোতে দেওয়া টোপাকুলের ভরপুর গন্ধ, রাত্তিরে জ্যোৎস্নায় চকচক করা নারকেল গাছের পাতা—সে সময়ে সবই সম্ভব ছিল।.....চুপ করে বসে আছি। ঝিরঝিরে বাতাসে দীঘির জলে ডুরে ডুরে ঢেউ উঠেছে। লিচু আর জামরুল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে মাটিতে রোদ আর ছায়ার আলপনা তৈরী করছে—আমগাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠছে একসারি কাঠপিঁপড়ে।"[৯] অথবা আর একটি বর্ণনাঃ "হঠাৎই মানুষটার চোখ যেন দুটো জানালা হয়ে গিয়েছে। ভেতর কতদূর অবধি দেখতে পাচ্ছি। ওখানে যেন আর একটা জগৎ, এ রকমই রোদ্দুর ঝাঁঝাঁ করছে দিগন্ত অবধি বিছিয়ে থাকা মাঠে। সবুজ বন, নীল পাহাড় থেকে ঝুরঝুর করে ঝরনা নেমে আসছে—মেঘে আর কুয়াশায় ঢাকা ওই পাহাড়ে কবে যেন আমি থাকতাম। সুতোর কাটিম উলটো দিকে ঘুরে যাওয়ার মতো বিস্মৃতির আড়াল থেকে কত পুরনো, মহাকালের স্তরে স্তরে সঞ্চিত ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়ে যেতে লাগল। ক্রমে আমার সমস্ত চেতনা ওই দুই চোখের জানালার ভেতর দিয়ে আশ্চর্য জগৎটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের গ্রামের সীমানায় চটকা গাছটা, চিলের তীক্ষ্ণ ডাক, সামনে পড়ে থাকা কইখালির বিশাল মাঠ—সব কোথায় মিলিয়ে গেল। এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সে জগতে ছায়াবাজির মত অজস্র ছবি মেলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। কোথায় যেন এক উন্নতশীর্ষ মন্দির, শেষবেলার আলোয় তার চূড়ার সোনার পদ্ম ঝলসে উঠছে। কাদের হাসিমুখ—এরা আমাকে খুব ভালোবাসত, কিন্তু এখন মিলিয়ে গিয়েছে দূর অতীতে। কানে ভেসে আসছে সমস্বরে উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনির মত একটানা উদার-গম্ভীর সঙ্গীতময় শব্দপ্রবাহ। সব ছবি মিলিয়ে গিয়ে চোখের ওপর ভেসে উঠছে সৃষ্টিপূর্ব আদিম অন্ধকারের মত কালো মহাশূণ্য—থেকে থেকে সেই পরম কিছু না-র মধ্যে চমকে উঠছে তীব্র জ্যোতির উদ্ভাস, সৃষ্টি হচ্ছে নক্ষত্রের, নীহারিকার, অনন্ত শূণ্যের থেকে বস্তুপুঞ্জের।"[১০] এ বর্ণনায় যেমন রয়েছে রোমান্সময়তা তেমনই তা রহস্যমেদুরতায় ভরা। হঠাৎ করে মনে হয় যেন বিভূতিভূষণের লেখা কোনো বর্ণনা পড়ছি। ভাষা ভঙ্গিমায় যা অনেকাংশে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখণীরও অনেক কাছাকাছি (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বড় গল্প 'আলেয়ার আলো'-তে সমতুল বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায়)। অলৌকিক গল্প পড়তে বা শুনতে গিয়ে সাধারণতঃ পাঠকমনে যা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশ্বাস-

অবিশ্বাসের দোলায় কখনও অবিশ্বাস টলে গেছে, আবার কখনো অবিশ্বাস দুরন্ত বিষধর সাপের মতো ফনার চাবুক হেনে আঘাত করতে চেয়েছে তথাকথিত বিশ্বাসকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলার সেই চমৎকার বর্ণনা আছে 'পঞ্চমুন্ডির আসন' গল্পে। লেখকের ভাষায়ঃ "বৃষ্টির দিন। মট্ লেন জলে ভেসে যাচ্ছে, আর ভেতরে আমরা মুগ্ধ হয়ে গল্প শুনে যাচ্ছি। কিন্তু পরের দিন সকালে অফিসে গিয়ে খাতায় সই করে কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গতদিনের বিশ্বাসের ভিত নড়ে যেত। কলেজে আই.এ. পড়ার সময় কোলরিজের 'রাইম অফ্ দি অ্যানসেন্ট ম্যারিনার পাঠ্য ছিল। অধ্যাপক উইলিং 'সাসপেনশন অফ্ ডিসবিলিফ্' বলে একটা সাহিত্যিক জাদুর কথা বলেছিলেন। অপ্রাকৃত কাহিনি পড়ার আগে পাঠক মনকে প্রস্তুত করে নেয়, তার অবিশ্বাসকে সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখে। তারানাথের গল্প শোনার সময়ও তাই হত।"[১১]

গল্পগ্রন্থের অনেক গল্পেই তন্ত্র-মন্ত্র সিদ্ধ সাধনার বিবরণে প্রাচীন তন্ত্র শাস্ত্র প্রসঙ্গ এসেছে। যেমনঃ ১. "বললাম—কালভৈরব কে? -তিনি শুভশক্তির প্রয়োগকর্তা। দক্ষিণকালিকাতন্ত্রে তাঁর রূপ কল্পনা করা হয়েছে এইভাবে—মহাবলশালী পুরুষ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নগ্নগাত্র, রিপুতাড়ন তাঁর প্রধান কর্ম। শূকরের ছদ্মবেশে কাম-ক্রোধ-হিংসা ইত্যাদি রিপুগণ তাঁর বশবর্তী হয়ে সর্বদা তাঁর সঙ্গে ঘোরে। নিজের বুকের পাঁজরের একখানা হাড় দিয়ে তিনি তাদের শাসন করেন।"[১২] ২. "তুমি বুঝবে না, যোগিনীতন্ত্রম্ নামে একটা পুঁথি আছে, তার পঞ্চমপটলে—মানে অধ্যায়ে লেখা আছে: শিবাসর্পসারমেয়বৃষভাণাং মহেশ্বরী।/নরমুন্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি হীরিতম্।।"[১৩] ৩. "দেবী কালীর পূজা প্রথমেই করে নিই বটে, কিন্তু মধ্যরাত্রি থেকে মধুসুন্দরী দেবীর পূজা করি ভোর রাত পর্যন্ত। এই পূজা সাধারণ পূজা নয়। কারণ আগমতন্ত্রে মধুসুন্দরী দেবীর উল্লেখ এবং স্তব আছে বটে, কিন্তু পূজার বিস্তৃত ব্যবস্থা ও প্রকরণ কিছু নেই। তা আমি পেয়েছি দশমাতৃকাতন্ত্রের শেষে কাঠের ত্রিপট্ট দিয়ে বাঁধা ঠাকুর্দার হাতে লেখা অন্ত্যপুঁথির পাতায়।"[১৪] ৪. "কোনো মেয়েকে আকর্ষণ করবার জন্য কোঁচবকের বাঁদিকের ডানার পালক হাতে নিয়ে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্তিরে লোকবসতির বাইরে নিমগাছের তলায় বসে দশহাজার বার জপ কর—'হ্রীং কালিকায়ৈ বিদ্মহে আকর্ষিনৈ ধীমহি তন্নঃ কালিকা প্রচোদয়াৎ"[১৫] ইত্যাদি। তান্ত্রিক উপচারের বর্ণনা দেখি গল্পের কোনো কোনো অংশে। যেমনঃ ১. "ফর্দে কি কি ছিল শুনবে? এই শোনোঃ সিদ্ধি, উপবীত, হর্তুকি, আতপ চাল, কলা, মাটির সরা ইত্যাদি যা সাধারণ ফর্দে থাকে। তার সঙ্গে ছিল প্রথম ফল ধরেছে এমন আমগাছের পোকায় খাওয়া পাঁচটি পাতা—একসঙ্গে হলুদ সুতোয় গ্রথিত, কলা বাদুড়ের ডানা, কেউ ডুবে মারা গিয়েছে এমন পুকুরের তলার মাটি, কলঙ্ক ধরা পুরনো পেতলের প্রদীপ ইত্যাদি ইত্যাদি।"[১৬] ২. "—জয়ন্তীর লোকায়ত সাধারণ নাম হলো জাঁইহর্তুকি। দশকর্ম ভাণ্ডারেও চাইলে পেতে পারো, কিন্তু প্রথমতঃ তা বহুদিনের শুকনো, এবং সত্যিকারের সেই গাছ কি না তা বলা কঠিন। ....এর সঙ্গে লাগে কালো ছাগলের খুরে লেগে থাকা মাটি, ছুরি দিয়ে সামান্য চেঁছে নিতে হয়, ঘোড়ার পিছনের পায়ের লোম ইত্যাদি। আকন্দ কাঠের আগুন তৈরী করে মাটির ছোট সরায় এই উপাদানগুলি পুড়িয়ে ছাই সংগ্রহ করতে হবে। ধরে রাখা বৃষ্টির জলে ওই ছাই মেখে সে ভস্মের তিলক কপালে পরিয়ে যজমানকে পাশে বসিয়ে যজ্ঞ শুরু করতে হয়।"[১৭] 'তারানাথ তান্ত্রিক'-এর কোনো কোনো গল্পের বর্ণনায় ভয়াবহতা আছে। এই ভয়াবহতা পাঠকমনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তার রেশও ক্রমে গোটা গল্প জুড়ে ছেয়ে যায়। এমনই এক বর্ণনাঃ "আমারই ভুল। অন্ধকারে ঐ ভয়ংকরের দৃষ্টি বাধা পায়না। এভাবে ওকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা বৃথা। আদিম জড়বিশ্বের বুদ্ধিহীন, চেতনাহীন অন্ধশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে একটা বিকৃত মানবদেহ অমোঘগতিতে আমার নিকটবর্তী হচ্ছে। কোনোক্রমে বাড়ি ফিরতে পারলে কয়েকটা গূঢ় প্রক্রিয়ার দ্বারা একে আমি ঠেকাতে পারি, কিন্তু এই মাঠে দাঁড়িয়ে তা সম্ভব নয়।"[১৮] এ বর্ণনা যেমন ভীতিপ্রদ তেমনি রোমাঞ্চকর। এর সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায় বিভূতিভূষণের তারানাথের বর্ণনা। শ্মশানে শবসাধনা করতে বসার কিছু সময় পর তারানাথের অনুভূতিঃ "হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে। ... আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকংকাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কতকালের পুরনো

জীর্ণ হাড়ের কংকাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনোটার মাথার খুলি ফুটো, কোনোটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কংকালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া করে রেখেছে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি কংকালগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙা-চোরা, তোবড়ানো নোনা ধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমায় গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।"[১৯] এ বর্ণনা পড়লে যেন বুকের রক্ত নিমেষে শুকিয়ে যায়। দুটি বর্ণনাই চরম দুঃস্বপ্নকেও হার মানায়। বিভূতিভূষণের এই অতিন্দ্রীয় অনুভূতি পুত্র তারাদাসের ব্যখ্যায়ঃ "Presentiment ও Clairvoyance মিশ্রিত তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি কিছুটা পরামনোবিজ্ঞানের শ্রেণিভুক্ত হয়েও শেষপর্যন্ত রোমান্টিকতাই।"[২০] তারাদাসের সৃষ্ট তারানাথের বর্ণনার ক্ষেত্রেও অনেকটা একই যুক্তি খাটে। বলাইবাহূল্য অ্যাডভেঞ্চারের রস, কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গী, ভূতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এই অদ্ভুত রোমান্টিকতার সাথে মিশেই যেন তারানাথকে তিলে তিলে সৃষ্টি করেছে। যে 'আধ্যাত্মিক উৎক্রান্তি ধর্মান্বিত রোমান্স পিপাসা'[২১] বিভূতিভূষণের তারানাথ চরিত্র সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণের শিল্প প্রকৃতির মুখ্য প্রবণতা—তা থেকে তারাদাসের তারানাথও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। সমালোচক গৌরীশংকর ঘোষের ব্যাখ্যায়ঃ "বিভূতিভূষণ মোটেও বিষয়ী ছিলেন না। বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু অর্থের প্রয়োজন তার বেশি রোজগার করার পেছনে সময় ব্যয়ের চেয়ে একটু বেড়িয়ে পড়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। কথায় আছে কপাল গুণে গোপাল জোটে, তাঁর ভাগ্যের আকাশে সেই অনুকূল হাওয়া বয়েছিল।"[২২] বিভূতিভূষণের এ আত্ম-স্বভাবের সাথে তাঁর সৃষ্ট তারানাথ চরিত্র পুরোপুরি মিলে যায়। তারাদাসের তারানাথ 'তারানাথ তান্ত্রিক'-এর গল্পে সেই স্বভাব বৈশিষ্ট্যকেই উত্তরাধিকার সূত্রে যেন বহন করে চলেছে মাত্র।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের কলকাতা কেমন ছিল তা গল্পগুলির নানান জায়গায় ছড়ানো ছিটোনো ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। এ কলকাতা আমাদের অজানা, যেন তা হারিয়ে যাওয়া কোনো এক অচেনা শহর। রথের দিনের কলকাতার এমনই এক বর্ণনা গল্পকথকের চোখেঃ "দেখলাম বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে মানুষের ঢল নেমেছে মেলাতলায়। ভিড়ের চোটে গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। কেবল হাসপাতালের গাড়ি চলাচলের জন্য ক্যাম্বেল স্কুলের সামনে একটুখানি ফাঁক। খানিকক্ষণ ধরে ফুল-ফল-নারকেলের চারা, মাটির পুতুল, রঙিন কাঁচের চুড়ির দোকানে অল্পবয়সী মেয়েদের ভিড়, পিঁ-পিঁ বাঁশি এসব দেখে বেড়ালাম। তবু বাল্যের সেই আনন্দ আর কই?"[১৯] এ বর্ণনা পড়ে মনে হয় শহর কলকাতা থেকে হারিয়ে গেছে অনেককিছুই। হারিয়ে গেছে মেলাতলা, স্বচ্ছ মোড়ক ওয়ালা চিমনির মতো টুপি পরা ধূমপানরত সাহেবের ছবিশুদ্ধ কালচে লাল রং-এর পাসিং শোর প্যাকেট, লুপ্তপ্রায় বাঙালির প্রিয় হুঁকো-কলকে, কাঁচি সিগারেট, বৈঠকখানা আর মজলিশি মৌতাত। হারিয়ে যেতে বসেছে বাঙালির বিশ্রাম-বিলাসের তাকিয়া বালিশ, বৃহৎ পারাশারি হোরা কিম্বা লম্বা বাঁশের হাতলওয়ালা ছাতি। অথচ একদিন এর প্রায় সবগুলোই মধ্যবিত্ত বাঙালির বনেদীয়ানার একেকটা বিশেষ চিহ্ন ছিল। শুধুই কি কলকাতা? গল্পে বর্ণিত—চড়ুইটিপ গাঁ, গাঁয়ের হাট—গঞ্জ, দই-চিঁড়ে মেখে সারা মধ্যাহ্ন ভোজ, শ্বেত বগলার পূজো, পাতকুয়ো, অতিথিকে দেওয়া পাথরবাটির চা—কোনো কিছুই আজ আর অবশিষ্ট আছে কি?

তথ্যসূত্র:

১. স্মৃতিরেখা, আমাদের সকলের বিভূতিবাবু, 'সানন্দা' পত্রিকা, ৪ঠা আগস্ট, ১৯৯৫
২. বিশ্বাসের ওপারে, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃত, ১লা জুলাই, ১৯৭৭
৩. বিভূতিভূষণের সঙ্গে কিছুক্ষণ, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৭

৪. তৃণাঙ্কুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫. প্রথম মুদ্রণের প্রাককথা, তারানাথ তান্ত্রিক, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৩৯২
৬. তারানাথ তান্ত্রিক, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃঃ৩৫
৭. তদেব, পৃঃ ১০৯
৮. তদেব, পৃঃ ১০৮
৯. তদেব, পৃঃ ১০৯
১০.তদেব, পৃঃ ১১১
১১. তদেব, পৃঃ ১২০
১২. তদেব, পৃঃ ১২০
১৩. তদেব, পৃঃ ১৩২
১৪. তদেব, তারানাথ তান্ত্রিক ও ব্রহ্মপিশাচ, পৃঃ১৫২
১৫. তদেব, আবার তারানাথ, পৃঃ১৩৬
১৬. তদেব, তারানাথ তান্ত্রিক ও ব্রহ্মপিশাচ, পৃঃ১৬১
১৭. তদেব, পৃঃ ১৬৩
১৮. তারানাথ তান্ত্রিক, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃঃ১১৭
১৯. তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২০. বিভূতিভূষণের দুটি দিক, শতবর্ষে বিভূতিভূষণ, সংবাদ প্রতিদিন, ৯ই আশ্বিন, ১৪০০
২১. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ভূদেব চৌধুরী, পৃঃ৫৭১
২২. চিরন্তন অরণ্যের সন্তান, শতবর্ষে বিভূতিভূষণ, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, সংবাদ প্রতিদিন, ৯ই আশ্বিন, ১৪০০

গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকা:

১। তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। তারানাথ তান্ত্রিক, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬
৩। অলাতচক্র (তারানাথ তান্ত্রিক ২), তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩
৪। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ভূদেব চৌধুরী
৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে নভেম্বর, ২০১৫
৬। সংবাদ প্রতিদিন, ৯ই আশ্বিন, ১৪০০
৭। সানন্দা পত্রিকা, ৪ঠা আগস্ট, ১৯৯৫